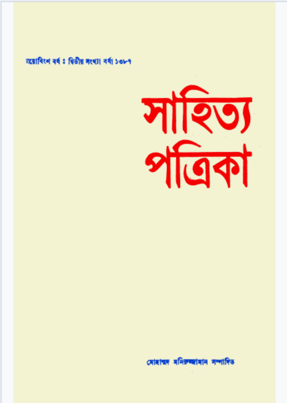

Vol. 23 | No. 2 | 1980

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্যারীচাঁদ : সঙ্গীত প্রসঙ্গ ও গীতাঙ্কুর

Volume	23
Issue	2
Year	1980
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	June 1, 1980
DOI	10.62328/sp.v23i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v23i2.4
Pages	197-227
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

প্যারীচাঁদ : সঙ্গীতপ্রসঙ্গ ও গীতাঙ্কুর

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

প্যারীচাঁদ-মানসে দু'টি বিশেষ প্রবণতা প্রত্যক্ষ : সমাজচিন্তা ও অধ্যাত্মচিন্তা। উভয়ই পরস্পরসংলগ্ন ও সার্বক্ষণিক। সমাজচিন্তার অন্তর্গত প্রসঙ্গসমূহে তিন স্তর। প্রথম স্তরে সুনীতি-দুর্নীতির মোটা রেখায় আঁকা তাঁর সমকালীন কলকাতার সমাজচিত্রাবলী : দ্বিতীয় স্তরে সামাজিক 'সঙ্কট'-মোচনের লক্ষ্যে শিক্ষা, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষায় গুরুত্বারোপের নানা প্রয়াস ; তৃতীয় স্তরে কৃষিবিষয়ক ভাবনাসমূহ। তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা মূল ব্যক্তিগত সংকট-জাত হলেও পরিণামে সমাজচিন্তা-সংযুক্ত এবং সেই অর্থে তাঁর সমাজচিন্তারই চতুর্থস্তর।- প্যারীচাঁদ-মানসের সামগ্রিক পরিচয় অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি (১৯৫৯, ১৯৬৫, ১৯৬৭)। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য প্যারীচাঁদ-মানসের একটি ভিন্ন দিক : সঙ্গীতপ্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত।

বস্তুতঃ পক্ষে প্যারীচাঁদের সমাজচিন্তার পূর্বোল্লেখিত চার স্তরেই সঙ্গীতপ্রসঙ্গ এক উজ্জ্বল উপাদানরূপে উপস্থিত। প্রচলিত জীবনবৃত্তান্তে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬২) প্যারীচাঁদের সঙ্গীতচর্চার কথা অনুপস্থিত। অথচ তাঁর গদ্যরচনায় সঙ্গীতপ্রসঙ্গ আসে পৌনঃপুনিক-ভাবে। কখনো তা বর্ণনার কৌতুকরসের উন্মীলনে সহায়ক, এমনকি চরিত্রানুসারী লঘুগুরু ; কখনো বা গভীরতর তত্ত্বগন্ধী। সর্বোপরি রাগ-তালের উল্লেখসহ 'গীতাঙ্কুরে'র (১৮৬১) পঁয়ত্রিশটি গান নির্দেশ করে প্যারীচাঁদের অধিকার। এক হিসেবে তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন হওয়া সত্ত্বেও 'গীতাঙ্কুর' এ যাবৎ অনাদৃত ও অনালোচিত গ্রন্থ।

এক

প্যারীচাঁদের গদ্যরচনায় সঙ্গীতপ্রসঙ্গ সর্বাধিক এসেছে 'আলালের ঘরের দুলালে' (১৮৫৫, ১৮৫৮) : মোট পঁচিশ বার। 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯) গ্রন্থে আছে এগারো বার। যৎকিঞ্চিতে (১৮৬৫) সঙ্গীতপ্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আছে ; তাছাড়া ঐ গ্রন্থে 'গীতাঙ্কুরের' ১৭টি গান উদ্ধৃত হয়েছে ; অভেদীতে (১৮৭১) দুইবার ; 'আধ্যাত্মিকা'র (১৮৮০) একটি পরিচ্ছেদে সঙ্গীতের তত্ত্বালোচনা-সহ মোট আটবার এবং বামাতোষিণীতে (১৮৮১) দু'বার সঙ্গীতপ্রসঙ্গ আছে। ক্রমানুয়ে প্রসঙ্গসমূহ উপস্থাপন করলে চরিত্র ও চিত্র-রচনার উপাদান হিসেবে সঙ্গীত ও সঙ্গীত-প্রসঙ্গ ব্যবহারে প্যারীচাঁদের স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যক্ষগোচর হবে।

১

'আলালের ঘরের দুলালের' সঙ্গীত-প্রসঙ্গসমূহ প্রধানত পরিবেশ ও চরিত্রান্তর্গত বৈশিষ্ট্য ও কৌতুক নির্দেশক। আলাল বাবুরাম বাবুর ঘরের দুলাল মতিলালের 'হযবরল' ও 'কাফ গাফ আয়েন গায়েন'-শিক্ষা প্রয়াস ব্যর্থ হলে তাকে ইংরেজী পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে চাকর পাইক ও পুত্রসহ বাবুরামবাবু বোটে চড়ে বালীতে রওনা হলেন। পথের বর্ণনাংশে বাবু ও মাঝিদের অবস্থানবৈপরীত্য ধরা পড়েছে গান নির্বাচনে—একদিকে বাবুর সখীসংবাদে চটুল ভক্তিহীনতা অন্যদিকে মাঝিদের লোকগীতিতে কর্ণফুলীর উপকথা :

> পরে ভড় ভড় করিয়া হুকা টানিতেছেন----গুডুক গুলা এক এক বার ভেসে ভেসে উঠতেছে----বাবু স্বয়ং উঁচু হইয়া দেখতেছেন ও গুন গুন করিয়া সখীসংবাদ গাইতেছেন----"দেখে এলাম শ্যাম তোমার বৃন্দাবন ধাম কেবল আছে নাম"? ভাঁটা হওয়াতে বোঁট সাঁ সাঁ করিয়া চলিতে লাগিল—মাঝিরাও অবকাশ পাইল—কেহ বা গলুয়ে বসিল, কেহ বা বোকা ছাগলের দাড়ি বাহির করিয়া চারিদিগে দেখিতে লাগিল ও চাটগেঁয়ে সুরে গান আরম্ভ করিল "খুলে পড়বে কানের সোনা শুনে বাঁশির সুর" (আলালের ঘরের দুলাল, প্যারীচাঁদ রচনাবলী. পৃ. ৬২)

এখানে 'চাটগেঁয়ে সুর' চট্টগ্রামী উচ্চারণ নির্দেশক বলে মনে হয়।

বৈপরীত্যে চরিত্রসৃষ্টি প্যারীচাঁদের এক বিশিষ্ট কৌশল। আদর্শ চরিত্র বেণীবাবু কেমন নন সে কথা বোঝাতে এসেছে রবিবারে কুঠিওয়ালাদের প্রসঙ্গ :

> রবিবারে কুঠিওয়ালারা বড় ঢিলে দেন---হচ্ছে হবে—খাচ্ছি খাব—বলিয়া অনেক বেলায় স্নানাহার করেন----তাহার পরে কেহ বা বড়ে টেপেন—কেহ বা তাস পেটেন---কেহ বা মাছ ধরেন—কেহ বা তবলায় চাঁটি দেন—কেহ বা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করেন----কেহ বা শয়নে পদ্মনাভ ভালো বুঝেন—কেহ বা বেড়াতে যান---কেহ বা বহি পড়েন। কিন্তু পড়াশুনা অথবা সৎকথার আলোচনা অতি অল্প হইয়া থাকে। (ঐ, পৃ. ৬৪)

এই অংশে তবলা ও সেতার আলস্যের উপকরণ। উপকরণ ব্যবহারে অদক্ষতার নির্দেশ করা হয়েছে 'তবলার ক্ষেত্রে চাঁটি' এবং 'সেতারের ক্ষেত্রে' 'পিড়িং পিড়িং' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা।

দুলাল মতিলাল স্বভাবতঃই উচ্ছৃঙ্খল; অন্য আর যাই হোক, পিতা বাবুরামের মত সে-ও 'সখীসংবাদ' রপ্ত করেছে। তার গান প্যারীচাঁদের পরিভাষায় 'গানের চীৎকার'।

> মতিলাল শয়নাগারে গিয়া পান তামাক খাইয়া বিছানার ভিতর ঢুকিল। কিছুকাল এপাশ ওপাশ করিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া এক এক বার পায়চারি করিতে লাগিল ও এক এক বার নীলু ঠাকুরের সখীসংবাদ অথবা রাম বসুর বিরহ গাইতে লাগিল। গানের চোটে বাটীর সকলের নিদ্রা ছুটে পালাইল।.. গানের চীৎকারে চাকরের ও মালীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। (ঐ, পৃ. ৬৬)

সখীসংবাদে অবশ্য মিয়াজান গাড়োয়ানেরও সরব অধিকার---"শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই---ওগো মরমেতে মরে রই---টক্ টক্-পটাস"---পটাস, মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে--টিটকারি দিতেছে ও শালার গোরু চলতে পারে না বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাং সপাং মারিতেছে। (ঐ, পৃ. ৭২)

সঙ্গীত অবশ্য বৈদ্যবাটির বাবুরাম বাবুর বাবুয়ানার উপাদান। তিনি যখন বৈঠকখানায় 'বাবু' হয়ে বসেন তখন সেখানে তর্কপ্রবণ শাস্ত্রী ভট্টাচার্য, শতরঞ্চ খেলোয়াড়, মুহুরী ও খুচরো মহাজন ইত্যাদির সঙ্গে গায়কও উপস্থিত। 'এক পাশে দুই-একজন গায়ক যন্ত্র মিলাইতেছে---তানপুরা মেঁও মেঁও করিয়া ডাকিতেছে। (ঐ, পৃ. ৭৩১) শুধু তাই নয়; তাঁর বাড়ীতে হাজতী মতিলালের জন্য স্বস্ত্যয়নের ধূম লাগলে যখন কেহ তুলসী দেন---কেহ বিল্বপত্র বাছেন---তখন কেহ ববম্ ববম্ করিয়া গানবাদ্য করেন। (ঐ, পৃ. ৭৯)

বেণীবাবুও গান করেন তবে তাঁর গানের প্রসঙ্গ কৌতুককর নয়, সম্ভ্রমসূচক। বর্ণনাতেও 'কবিত্বের'র আভা :

> "চাঁদনী রাত্রি। গঙ্গার উপর চন্দ্রের আভা পড়িয়াছে----মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে---বনফুলের সৌগন্ধ্য মিশ্রিত হইয়া এক একবার যেন আমোদ করিতেছে---ঢেউগুলো নেচে উঠিতেছে। বালীর বেণীবাবু দেওয়ান গাজীর ঘাটে বসিয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে কেদারা রাগিণীতে "শিখেছো" খেয়াল গাইতেছেন। (ঐ, পৃ. ৮২)

'আদর্শ ও উচ্চাঙ্গ জীবন বেণীবাবুর প্রার্থিত তাই তার কণ্ঠে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত; তবে তিনি বরদাগঞ্জের বরদাবাবু নন; সুতরাং 'এদিক ওদিক' দেখেন।

ঠকচাচার মিথ্যাসাক্ষীতে মতিলাল কয়েদমুক্ত হল কিন্তু মতিলালের সহযোগী হলধর ও গদাধরের শাস্তি হল। জেলে যাবার মুহূর্তেও তারা

> প্রেমনারায়ণ মজুমদারকে দেখিয়া তাহার খেপানের গান তাহার কানে কানে গাইতে লাগিল---"প্রেমনারায়ণ মজুমদার কলা খাও, কর্মকাজ নাই কিছু বাড়ী চলে যাও। হেন করি, অনুমান, তুমি হও হনুমান, সমুদ্রের তীরে গিয়ে স্বচ্ছন্দে লাফাও।" প্রেমনারায়ণ বলিল---বটে রে বিটলেরা---বেহায়ার বালাই দূর---তোরা জেলে যাচ্ছিস, তবুও দুষ্টুমি করিতে ক্ষান্ত নহিস---। (ঐ, পৃ. ৮৩)

পরদিন সকালে বাবুরাম বাবুর বাড়ীর বোধনের বর্ণনাংশ :

> বৈদ্যবাটির বাটিতে বোধন বসিয়াছে---নহবত ধাঁধাঁগুড়গুড় ধাঁধাঁগুড় করিয়া বাজিতেছে। মুর্শিদাবাদি রোশনচৌকি পেঁও পেঁও করিয়া ভোরের রাগ আলাপ করিতেছে। (ঐ, পৃ. ৯২)

স্বস্ত্যয়নে আগত ব্রাহ্মণদের দুশ্চিন্তা : ঝড়ে যদি বাবুরাম বাবুর নৌকাডুবি হয়ে থাকে তবে কি হবে? সম্ভাব্য পরিবর্তিত অবস্থা, তাদের মতে 'ছ্যাং চ্যাংড়ার কীর্তন' তুল্য।

> এখন ছ্যাং চেংড়ার কীর্তন হইবে—ছোট বাবু কি রকম হইয়া উঠেন বলা যায় না।—বোধ হয় আমাদের প্রাপ্তির দফা একেবারে উঠে গেল। ঐ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজন আস্তে আস্তে বলতে লাগিলেন—ওহে তোমরা ভাবছো কেন? আমাদের প্রাপ্তি কেহ ছাড়ায় না—আমরা শাঁকের করাত—যেতে কাটি আসতে কাটি—যদি কর্তার পঞ্চত্ব হইয়া থাকে তবে তো একটা জাঁকাল শ্রাদ্ধ হইবে, কর্তার বয়েস হইয়াছে, যাগী টাকা লয়ে আতু আতু পুতু করিলে দশজনে মুখে কালি চুণ দিবে। (ঐ, পৃ: ৯২)

বেণীর গারদবাসে মতিলালের কোন চরিত্র পরিবর্তন হয়নি :

> পরদিবস গান গাইয়া ও শেয়াল কুকুরের ডাক ডাকিয়া নিকটস্থ লোকদিগকে এমতো জ্বালাতন করিয়াছিল যে, তাহারা কানে হাত দিয়া রাম রাম ডাক ছাড়িয়া বলাবলি করিয়াছিল—কয়েদ হওয়া অপেক্ষা এ ছোঁড়ার কাছে থাকা ঘোর যন্ত্রণা। (ঐ, পৃ. ৯৭)

মতিলালের নানা অসৎ সংসর্গ ও ইতর আমোদের বর্ণনার বিপরীতে ইংরেজ ছেলেদের বাল্যের ভূমিকা প্রসঙ্গে প্যারীচাঁদ লিখেছেন :

> ইংরাজদিগের ছেলেরা পিতামাতার উপদেশে শরীর ও মনকে ভালো রাখিবার জন্য নানা প্রকার নির্দোষ খেলা শিক্ষা করে, কেহ বা তসবির আঁকে—কাহারো বা ফুলের সক হয়—কেহ বা সংগীত শিখে—কেহ বা শিকার করিতে অথবা মর্দানা কস্ত করিতে রত হয়—যাহার যেমন ইচ্ছা, সে সেই মতো এইরূপ নির্দোষ ক্রীয়া করে। (ঐ, পৃ. ৯৮)

এখানে সঙ্গীত শিক্ষা চরিত্রগঠনের বিবিধ উপাদানের অন্যতম। ইংরেজী শিশুশিক্ষার সূত্রে বর্ণিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এ প্যারীচাঁদের ধারণার প্রতিফলন।

বহুবাজারের নিঃসন্তান বেচারামবাবু বেণীবাবুর সমর্থক ("তিনকাল গিয়েছে—এককাল ঠেকেছে, আমি প্রাণ গেলেও অধর্ম করিব না" : পৃ. ৭৮)। তাঁর সঙ্গীতচর্চার বিবরণ :

> তৎকালে বেচারামবাবু সদা সংকীর্তন লইয়া আমোদ করিতেন। বসতি ছাড়াইয়া নির্জন স্থান দিয়া যাইতে মনোহরসাহী একটা তুক্ক তাঁহার স্মরণ হইল। রাত্রি অন্ধকার—পথে প্রায় লোকজনের গমনাগমন নাই—কেবল দুই একখানা গোরুর গাড়ী কেঁকোর কেঁকোর করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে ও স্থানে স্থানে এক একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিতেছে। বেচারামবাবু তুক্ক সুর দেদার রকমে ভাঁজিতে লাগিলেন—তাঁহার খোনা আওয়াজ আশে পাশের দুই-একজন পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষ শুনিবামাত্র আঁও মাঁও করিয়া উঠল—পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদিগের আজন্মাকালাবধি এই সংস্কার আছে যে খোনা কেবল ভুতেতেই কহিয়া থাকে। ঐ গোলযোগ শুনিয়া বেচারামবাবু কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দ্রুতগতিতে একেবারে বৈদ্যবাটীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (ঐ, পৃ. ১০১)

নির্জন রাস্তায় 'তুক্কর সুর' 'দেদার রকম ভাজা'র পরিণামে বেচারামবাবুর 'খোনা' কণ্ঠস্বরে পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদের কানে ভূতের স্বররূপে প্রতিভাত হবার এই বর্ণনায় কৌতুকই মুখ্য। তবে বেচারামবাবুর বৈঠকখানার কীর্তনের আসরে ভক্তির প্রাবল্য :

> নিকটে দুই একজন লোক কীর্তন-অংগ গাইতেছেন। বাবু গোষ্ঠ, দান, মান, মাথুর, খণ্ডিতা, উৎকণ্ঠিতা, কলহান্তরিতা ক্রমে ক্রমে ফরমাইশ করিতেছে। কীর্তনীয়ারা মনোহরসাহী রেনিটি ও নানা প্রকার সুরে কীর্তন করিতেছে, সে সকল শুনিয়া কেহ কেহ দশা পাইয়া একেবারে গড়াগড়ি দিতেছে। বেচারামবাবু চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। (ঐ, পৃ. ১০৯)

বেণীবাবুর প্রথমবারের সঙ্গীতচর্চা ছিল কেদারা রাগে খেয়াল, দ্বিতীয়বার রামপ্রসাদী।

> রামপ্রসাদী পদ ধরিয়াছেন—"এবার বাজি ভোর হল"—পশ্চিম দিকে তরুলতার মেরাপ ছিল তাহার মধ্যে থেকে একটা শব্দ হইতে লাগিল—বেণীভায়া বেণীভায়া----বাজি ভোরই হল বটে। (ঐ, পৃ. ১৩৬)

প্রথম বারের মতই 'এদিকে ওদিকে' দেখতে দেখতে তিনি গান ধরেছিলেন এবং এবারও গানের মধ্যে বাধা—বেচারামবাবু ; তিনি এসেছেন বাবুরামবাবুর কঠিন পীড়ার সংবাদ নিয়ে।

বাবুরামবাবুর মৃত্যুর পর অসৎসঙ্গে ও পরামর্শে মতিলালের ষোলকলা পূর্ণ হ'ল। মতিলালের সৌদাগরি কর্মে যাত্রার উদ্যোগে কর্মসংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানের বদলে বাদ্যযন্ত্রাদির সমাবেশ কর্মপরিণামের নির্দেশক :

> কেহ সেতারার মেজরাপ হাতে দেয়—কেহ বায়ার গাব আছে কিনা তাহা ধপ ধপ করিয়া পিটে দেখে—কেহ তবলায় চাটি দিয়া পরখ করে—কেহ কেহ ঢোলের কড়া টানে —কেহ বেয়ালায় রজন দিয়া ডাডা ডাডা করে...(ঐ, পৃ. ১৫০)

সুতরাং নৌকায় উঠে তারা 'সখীসংবাদ' ধরবে এটাই স্বাভাবিক :

> নববাবুরা নৌকায় উঠিয়া সকলে চিৎকার স্বরে এক সখীসংবাদ ধরিলেন... (ঐ, পৃ. ১৫১)

বেচারামবাবুর 'খোনা' স্বরের গান গম্ভীর প্রসঙ্গে প্রবেশের পূর্বে কৌতুকাবহ সৃষ্টির টেকচাঁদী কৌশল : এই কৌশলের দ্বিতীয় প্রয়োগ :

> দক্ষিণ দিক থেকে কতকগুলো কুকুর ডাকিয়া উঠিল ও রাস্তার ছোঁড়ারা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল—গোল একটু নরম হইলে "দূঁর দূঁর" ও "গোপী-দের বাড়ী যেও না করি রে মানা" এই খোনা স্বরের আনন্দলহরী কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বেণীবাবু ও বরদাবাবু উঠিয়া দেখেন যে বহুবাজারের বেচা-রামবাবু আসিতেছেন—গানে মত্ত ক্রমাগত তুড়ি দিতেছেন। (ঐ, পৃ. ১৫৭)

এই পরিচ্ছেদে (২৪) বরদাবাবুর সঙ্গে 'শুদ্ধচিত্তের কথা'র পর বেচারামবাবু যখন ফিরে যাচ্ছেন তখনও তার কণ্ঠে গান এবং পরিবেশ লঘু :

> এখানে বালি হইতে বেচারামবাবু পার হইয়া বৈকালে ছকড়া গাড়িতে ছড়র ছড়র শব্দে "সেই যে ভস্মমাখা জটে—যত দেখো ঘটে পটে সকল জটের মুটে" এই গান গাইতে গাইতে উত্তরমুখো চলিয়াছেন—দক্ষিণ দিক থেকে বাঞ্ছারাম বগি হাঁকাইয়া আসিতেছেন—দুইজনে নেক্টা-নেক্টি হওয়াতে ইনি ওঁকে ও উনি একে হুমড়ি খাইয়া দেখিলেন .. (ঐ, পৃ. ১৬১)

ইংরেজ শিশুর চরিত্র গঠনের উপাদানরূপে পূর্বে প্যারীচাঁদ সঙ্গীতের উল্লেখ করে-ছিলেন। ইংরেজ নীলকর, সুতরাং গান করে, তবে সে দাঙ্গাবাজ এবং একটি বাক্যেই তার পরিবেশ পরিস্ফুট :

> নীলকর সাহেব দাঙ্গা করিয়া কুঠিতে যাইয়া বিলাতী পানি ফাটাস্ করিয়া ব্রাণ্ডি দিয়া খাইয়া শিস দিতে দিতে "তাজা বতাজা" গান করিতে লাগিলেন —কুকুরটা সম্মুখে দৌড়ে দৌড়ে খেলা করিতেছে। (ঐ, পৃ. ১৬৫)

উল্লেখযোগ্য, পরবর্তীকালে 'তাজা বতাজা' উদ্দীপনার অনুষঙ্গে ব্যবহার করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম ("তাজাবতাজার গাহিব গান")।

মতিলালের পতনের পর বেণীবাবুর বাড়ীতে প্রেমনারায়ণ, বেণীবাবু ও বেচারামবাবু—তিন 'শিল্পী'র চরিত্রানুসারী সঙ্গীতসহ ক্রমসমাবেশ ঘটেছে :

> এদিকে মতিলাল নিরুদ্দেশ—দলবলও অন্তর্ধান—ধুমধাম কিছুই শুনা যায় না—প্রেমনারায়ণ মজুমদারের বড়ো আহলাদ—বেণীবাবুর বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া তুড়ি দিয়া "বাবলার ফুল লো কানে লো দুলালী, মুড়ি মুড়কির নাম রেখেছ রূপালী সোনালী" এই গান গাইতেছেন। ঘরের ভিতরে বেণীবাবু তানপুরায় মেও মেও করিয়া হামির রাগ ভাঁজিয়া "চামেলী ফুলি চম্পা" এই খেয়াল স্বরৎ মুর্ছনা ও গমক প্রকাশপূর্বক গান করিতেন। ওদিকে বেচারামবাবু "ভবে এসে প্রথমেতে পাইলাম আমি পঞ্জড়ি" এই নরচন্দ্রী পদ ধরিয়া রাস্তায় যাবতীয় ছোঁড়াগুলাকে ঘাঁটাইয়া আসিতেছেন। বিরক্ত হইয়া "দূঁর দূঁর" করিতেছেন। যৎকালে নাদের শা দিল্লী আক্রমণ করেন তৎকালীন মহম্মদ শা কিছুমাত্র না বলিয়া সঙ্গীতসুধা পানে ক্ষণকালের জন্যেও ক্ষান্ত হয়েন নাই—পরে একটি কথাও না কহিয়া স্বয়ং আপন সিংহাসন ছাড়িয়া দেন। বেচারামবাবুর আগমনে বেণীবাবু তদ্রূপ করিলেন না—তিনি অমনি তানপুরা রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সম্মানপূর্বক তাঁহাকে বসাইলেন। (ঐ, পৃ. ১৭৮)

গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে, বৃন্দাবন ও বারাণসীতে, সঙ্গীত ধর্ম-আবহ রচনায় প্রযুক্ত। মতি-লালের মাতা ও ভগ্নি গৃহহারা হয়ে বৃন্দাবন গেছেন, সেই সূত্রে বৃন্দাবনের বর্ণনা। বর্ণনায় অনুপ্রাসের ব্যবহার পরিবেশের সঙ্গীতে অতিরিক্ত দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে :

> শরতের আবির্ভাব— ত্রিযামা অবসান —বৃন্দাবনের কিবা শোভা! চারিদিকে তাল, তমাল, শাল, পিয়াল, বকুল আদি নানাজাতি বৃক্ষ—তদুপরি সহস্র সহস্র পক্ষী নানারবে গান করিতেছে—বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে—যমুনার তরঙ্গ যেন রঙ্গচ্ছলে পুলিনের একাঙ্গ হইতেছে—ব্রজবালক ও ব্রজবালিকারা কুঞ্জে কুঞ্জে পথে পথে বীণা বাজাইয়া ভজন গাইতেছে। (ঐ, পৃ. ১৮৭)

বারাণসীতে ধর্মাচারের নানা বর্ণনার মধ্যে সঙ্গীতপ্রসঙ্গ :

> কত কত কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ, রবাব ও তানপুরা লইয়া ধ্রুপদ, ধরু, খেয়াল, প্রবন্ধ, ছন্দ, সারবন্ধ, তেরানা, সরগাম, চতুরং ও নক্সগুলে মশগুল হইয়া আছে। (ঐ, পৃ. ১৯১-১৯২)

গ্রন্থশেষে ঠকচাচী চুড়িওয়ালী এবং প্রেমনারায়ণ নবদ্বীপ বাসী হয়েছে। উভয়ের কণ্ঠে গানের 'চিৎকার'।

যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত ঠকচাচা ও বাহুল্য-র পুলিপলিমে মৃত্যু হলে—

> ঠকচাচী কোনো উপায় না দেখিয়া চুড়িওয়ালী হইয়া ভেটিয়ারি গান "চুড়িয়ালের চুড়িয়া" গাইতে গাইতে গলি গলি ফিরিতে লাগিল" (ঐ, পৃ. ১৯৫)

অন্যদিকে নববাবুদের যন্ত্রণামুক্ত

> প্রেমনারায়ণ মজুমদার ভেক লইয়া "মহাদেবের মনের কথা রে অরে ভক্ত বই আর কে জানে" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন— (ঐ, পৃ. ১৯৫)

২

'মদখাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯) গ্রন্থে নানারূপী মাতালের অন্যতম ভবানীপুরের ভবানীবাবু। 'মদে মত্ত' হলে কি 'ঘোর বিপদ ঘটে' তার বিবরণাংশে সপার্শ্বদ প্রমত্ত ভবানীবাবুর বৈঠকখানার চিত্র আছে। ঐ চিত্রে মাতালদের গানের প্রসঙ্গ তাদের উন্মত্ততর প্রদর্শনীরূপে উপস্থাপিত :

> যখন সকল অবতার একত্র হন, তখন এমনি মেরোয়া হইয়া উঠেন যে, বোধ হয় যেন, ইংরাজের কেল্লা গেল। একদিক্ থেকে একজন ঠাকরুণ বিষয়ের চিতেন ধরেন, অমনি আর একজন তাহার মুখের কাছে হাত নেড়ে বিরহ গান, আর এক দিক থেকে একজন ধ্রুপদের আলাপ করেন, অমনি আর একজন তাহার ঘাড়ের উপর দুটি পা তুলিয়া দিয়া মুখের সামনে মুখ রেখে গাধার ডাক ডাকেন। (প্যারীচাঁদ রচনাবলী পৃ. ২০৪)

ভবানীবাবুর সঙ্গীতের সমঝদারীর স্বরূপ ধরা পড়ে যাত্রাদলের সঙ্গে তার ব্যবহারে। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায় ভবানী কৃষ্ণসন্ধানী :

> পূজার সময় নবমীর রাতে বাটীতে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হচ্ছে—ভবানীবাবু সমস্তরাত্রি তাকিয়ার উপর হাত দিয়া ঝিমুচ্ছেন—এক একবার বোধ হচ্ছে যেন পড়ে গেলেন। ভোরে তোপের শব্দে চমকিয়া উঠিলেন, চোক খুলে চারিদিকে ফেল ফেল করিয়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাত্রাওয়ালাদের বলিলেন—'শালারা! সারারাত কেবল মালিনীর গান শুনায়ে হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়েছিস—কৃষ্ণ বাহির কর—যাত্রাতে কৃষ্ণ নাই" তো বেটাদের থামে বেঁধে মারব। (ঐ, পৃ. ২০৪)

'লাউসেনের পৌত্র আগড়ভম সেন নেশাদাস ("কোন নেশাই বাকি নাই")। দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ তার বৈশিষ্ট্য। নেশাগ্রস্ত পক্ষীরাজ আগড়ভম যে সমস্ত গান গায় তার তালিকা :

> পরে পক্ষিদলের পক্ষিরাজ হইয়া সমুদয় রজনী সজনী সজনী বলিয়া চীৎকার পুরঃসর সখীসংবাদ, বিরহ, লাহড়, খেউড়, টপ্পা, নক্কা, জঙ্গলা, গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন। (ঐ, পৃ. ২১৫)

পক্ষীদের গানের বৈশিষ্ট্য :

> পক্ষীদিগের গান সকল অতি বিচিত্র। সকলে মিলে সর্বদা এই গান গাইত— "বড় বিলের পাখী মোরা ছোটবিলের কে, আধার না পেয়ে পাখী মূলঃ ধরেছে —কুকু রামশালিকে কু কু কু গংগাফড়িং। (ঐ, পৃ. ২১৬)

পক্ষীদের অপর গান :

> "ওমা সিংহ দিয়া অসুর কামরাণী—ডঙ্কফোগ ধরণী" এই গান পক্ষীরা চীৎকার করিয়া ধরিল। (ঐ, পৃ. ২১৯)

'ভুবনমোহিনী'র জন্য অপেক্ষমান পক্ষীরাজের বিচলিত কণ্ঠে বিষাদের টপ্পা :

> "কেন আমারে বারে বারে বল তুমি তাঁর" (ঐ, পৃ. ২২১)

অন্যদিকে গোপন মাতাল সভাচূড়ামণি ভবশঙ্করের বৈঠকখানায় যাত্রাগানের কদর, খেয়াল সেখানে বেমানান : উভয়েরই পরিবেশক গোস্বামী :

> ভবশঙ্কর। গোসাই মামা—ভাই একটা যাত্রার গান গাও না! (এই বলিয়া প্রেমচাঁদের পিট টিপ টিপ করিয়া বাজাইতে লাগিলেন)
>
> বাচস্পতি। শাস্তব্যবসায়ী হওয়া বড় দায়—অশুদ্ধ শুনিলেই শুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়। গোঁসাই মামা বলিয়া কি ভাই বলে? বলিতে হয়—গোঁসাই বাবা—ভাই, একটা গান গাও না।
>
> গোস্বামী। 'আমাকে মামাই বল—বাবাই—দাদাই বল, আর কোন মিষ্ট কুটুম্বিতার কথা বলিয়া সম্মোধন কর, আমি সেই গোঁসাই। আমার জ্ঞান টন্‌টনে —আমি গাই—শুন।' এই বলিয়া বাগীশ্বরী রাগিণীতে গম্ভীর স্বরে এক খেয়াল ধরিলেন—মো-য়ে-য়ে-য়ে-য়ে-লা-লা-লা-লা-লা-গি-গি-গি-গি
>
> বাচস্পতি। আরে বাপু, এ গান বুঝিতে গেলে আকোনের কাছে গিয়া ফাশি পড়িতে হয়। সাদাসিদে রকম মজাদারি একটা আড়খেমটা যাত্রার গান গাও।
>
> গোস্বামী যাত্রার গান আরম্ভ করিবামাত্র সকলেই দাঁড়াইয়া ধিং ধিং করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু নেশার জোরে পা নোটিয়া পড়িল, এজন্য টুপতুজঙ্গ হইয়া পরস্পরের ঘাড়ের উপর পা, পায়ের উপর মাথা দিয়া চলচিচত্রের পুত্তলিকার ন্যায় ধড়াস ধড়াস করিয়া পড়িয়া গেলেন ও শিয়াল ডাক, কুকুর ডাক, বিড়াল ডাক, ডাকিতে লাগিলেন। (ঐ, পৃ. ২৩১)

ভবশঙ্করের সভার এক মাতাল সদস্য রামকৃষ্ণের গান ও তার প্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য :

> রামকৃষ্ণ। ...আমার একটা গান শুন দেখি—'না দেখে বঁধুকে প্রাণ যায়।'' রামকৃষ্ণ যেমন তেড়ে গান ধরিয়াছেন, হরেকৃষ্ণ অমনি পড়িয়া গেলেন। (ঐ, পৃ. ২৩৫)

ভবশঙ্করের মাতালসভার সঙ্গীতচর্চার আর একটি দৃশ্যেও গোস্বামীর উচচনিম্ন দ্বিবিধ গান পরিবেশনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া :

> বলরাম মদ্য আনয়ন করিয়া দিলে সকলেই প্রচুর পরিমাণে পান করিলেন।
> ভবশঙ্কর। গোসাই একটা গান কর দেখি, আনন্দ করা যাউক।
> গোস্বামী। ঘাড় বাঁকাইয়া গালে হাত দিয়া ঝিঁজিট রাগিণীতে গাইতে লাগিলেন—
> ''গ্রাস করে কাল পরামায়ু প্রতি ক—ণে—ণে—'
> বাচস্পতি। আর জ্বালাও কেন? পরমায়ু তো অদ্য গ্রাস হইয়াছিল, সে কথা আর কেন? এক্ষণে রং গাও।
> গোস্বামী। 'ওলো আয় রে ব্রজের নারী এনেছি তরী, তোদের পার করি—হুড়রে হো—হুড়রে হো—হুড়শ হো—'
> বাচস্পতির চাদরখানা একপার্শ্বে পড়িয়া ছিল, পৈতেটা কানে গোঁজা—বাম হাতে হুঁকা—খেমটার চোট সামালিতে না পারিয়া তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। (ঐ, পৃ. ২৩৮)

কুচবিহারবাসী ব্রাহ্মণের জাতি ধর্মবিষয়ক স্বপ্নদর্শনের শেষ পর্যায়ের গরুরূপ জাতির লেজহানীজনিত ''গাঁ গাঁ হাম্বা হাম্বা'' রবের সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গের পর শোনা ''কয়েকজন বৈরাগীর'' খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাওয়ার পরোক্ষ তুলনা কৌতুকাবহ।

এই গ্রন্থের শেষে রামানন্দ ও ভজহরী নামের দু'জন লম্পট কুলীন রামপ্রসাদ ডোমের বিধবা কন্যাকে অপহরণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরদিন প্রত্যাগত রামপ্রসাদ এ কথা শুনে উভয়লম্পটকে প্রচণ্ড পাদুকা প্রহার করে। এই প্রহারকে প্যারীচাঁদ 'রামপ্রসাদি পদ' বলে উল্লেখ করেছেন: ''রামপ্রসাদি পদের পর রামানন্দ ও ভজহরী কোন প্রসাদ অন্বেষণ না করিয়া কিঞ্চিৎকাল মৌনভাবে থাকিলেন।'' (পৃ. ২৫০) শেষ পর্যন্ত তারা পূর্ববর্তী জালমামলার অপরাধে 'ধৃত' হয়ে 'চালান' হল।

> ঐ সময় একজন ঢুলি রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, একটু আহলাদিত হইয়া দমেফ হাত নেড়ে২ বাজাইতে লাগিল ''জামাই ভাত খেসেরে, তোর শ্বশুর নাই ঘরে'' ...। (ঐ, পৃ. ২৫০)

৩

'রামরঞ্জিকায়' (১৮৬০) উপাদান হিসেবে গান ব্যবহৃত হয়নি তবে মহাভারতের ও কবিকঙ্কনের কবিতাংশ উদ্ধৃত হয়েছে অনেকবার। উপস্থাপনায় লঘুচিত্র ক্রমান্তর্হিত।

১৮৬০ সালে স্ত্রীবিয়োগের পর প্যারীচাঁদমানসে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। (১৯৫৯, ১৯৬৫, ১৯৬৭) একালের অধ্যাত্মচিন্তা সমাজ-চিন্তায় গাম্ভীর্য এনেছে; লঘুপ্রসঙ্গ প্রায়-বর্জিত হওয়ায় গান ব্যবহারে তার প্রভাব পড়েছে এবং তিনি নিজে গান রচনায় আগ্রহী হয়েছেন; তার গানের বই 'গীতাঙ্কুর' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। 'যৎকিঞ্চিতে' (১৮৬৫) গীতাঙ্কুরের সতেরটি গানের উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। গান কখনো চরিত্রের কণ্ঠে উপস্থাপিত কখনো কেবলি উদ্ধৃতি। তাছাড়া রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃতি আছে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের

সূচনায়। এ গ্রন্থে গান ব্যবহৃত হয়েছে চরিত্রের আধ্যাত্মিক গভীরতা ও পরিবেশের গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য। গান প্রসঙ্গে এ গ্রন্থের মন্তব্যে এই মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষণীয়:

> যখন আমরা কোন অপূর্ব সঙ্গীত শ্রবণ করি, যে সঙ্গীত শ্রবণে আত্মা ভক্তি ও প্রেমে প্লাবিত হয়, তখন আমরা বলি যে, এই সঙ্গীত প্রকৃত স্বর্গীয় সঙ্গীত, দেবতারা বুঝি এরূপ গান করিয়া থাকেন।" (যৎকিঞ্চিৎ, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, পৃ. ৩৬৭)

৪

'অভেদী'তে (১৮৭১) সঙ্গীতের লঘুগুরু প্রসঙ্গ পতিভাবিনীর বিশ্লেষণে উপস্থাপিত:

> একজন সংস্কৃতা রসোল্লাসিনী অঙ্গনা এই গাইতেছেন—
>
> সোহিনী বাহার—তাল আড়া
>
> হৃদি মোর জ্বলে সদা পতি বিরহে
> সব সুখ শেষ হল কাজ কি এ দেহে
> ধিক ধিক এ জীবন কেন-না হয় নিধন
> দারুণ যন্ত্রণা মোর আর কে সহে।
>
> এই সঙ্গীত শ্রবণে পতিভাবিনীর বদন একটু হাস্যের মাধুর্যে বর্ণান্তর হইল ও তিনি মনে করিলেন যে, বেশ্যার এ বিলাপ যদি কেবল পতির জন্য হয়, তবে এ ভাব প্রশংসনীয়। বেশ্যা যাহা গান করিতেছিল তাহা ভাব বর্ধন জন্য নহে; কেবল চটক ও বাহ্য আমোদ জন্য; সুতরাং ক্রমশঃ সঙ্গীতের সাধুভাব তিরোহিত হইতে লগিল। পতিভাবিনী তাহাতে মন আর না দিয়া পতিভাবিনী হইয়া চলিয়া গেলেন। রাত্রি অন্ধকার ঝিল্লি রব হইতেছে—বনরাজি-উপরি পক্ষীরা খট খট করিয়া পাখা নাড়িতেছে—শিবা সকল হুক্কা হুয়া শব্দ করিতেছে—রাখাল হুক্কা হাতে চিৎকার করিয়া গান করিতেছে—
>
> "যদি শ্যাম না এলো আজু বিপিনে
> তবে কি করি সজনী।"
> (অভেদী প্যারীচাঁদ রচনাবলী, পৃ. ৪৫৩)

দুই ইহজাগতিক: রসোল্লাসিনী ও রাখালের সঙ্গীতচর্চার লাস্য ও চিৎকার পতিভাবিনীর অধ্যাত্মচিন্তার পরিবেশ-পটভূমি রচনা করেছে। গ্রন্থশেষের 'গীতাঙ্কুরে'র উদ্ধৃতি প্যারীচাঁদের অধ্যাত্মচেতনার পর্যায় নির্দেশক।

৫

'আধ্যাত্মিকা'য় (১৮৮০) বিভিন্ন পেশার সাধারণ মানুষের চরিত্রে 'মদ খাওয়া'-পর্যায়ের গানের ব্যবহার পুনরায় লক্ষ্যগোচর হয়। 'মদ খাওয়াতে' একজন ঢুলির বোলে কৌতুক

ছিল। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাঁচজন ঢুলি ঢোল বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে বোলের প্রতিযোগিতা করছে (আধ্যাত্মিকা, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, পৃ. ৫২৮)। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দুই কৃষক, পেয়ারাওয়ালী ও মিসিওয়ালীর গানে ইহলোক পরলোক প্রসঙ্গ এসেছে। দুই কৃষকের গান :

> গোধূলি সময়ে এক কৃষক গরু লইয়া গৃহে যাইতেছে, শ্রান্তিহ্রাস করিবার জন্য গান করিতেছে—"বাঁচিত বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়। যৌবন জনমের মত যায় সে তো আশাপথ নাহি চায়।" আর একজন কৃষক গান করিতে করিতে যাইতেছে—"ওরে প্রেম কি যাঁচলে মেলে, খুঁজলে মেলে, সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে।" (ঐ, পৃ. ৫৩৬)

পেয়ারাওয়ালীর গান :

> আর মনের মন যদি পাও প্রাণমন সপ তাঁরে
> এক শঠের সঙ্গে প্রীতি করে মজবে ধনী ফেরে। (ঐ, পৃ. ৫৩৬)

মিসিওয়ালীর গান :

> "ঘনরা মোরায়া সিহরে ছা।" (ঐ, পৃ. ৫৩৭)

একাদশ পরিচ্ছেদে দোকানীদের কথাবার্তায় যে দৈনন্দিনতা গানেও তার প্রতিফলন :

> আবরু সরম রেখেছে সজনের ডাটা।
> টাকায় চাল হয় ষোল কাঠা। (ঐ, পৃ. ৫৪৩)

পরিচ্ছেদের শুরুতে অবশ্য দোকানী রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান ধরেছিল :

> দ্বন্দ্ব করেছিলাম মন্দ করিলি আমার।
> তুই রাইকে দিলি শাপ, তাইতে মনস্তাপ।
> আর কি দেখা পাব শ্রীরাধার
> অন্ধ হলেম কেঁদে কেঁদে নিরানন্দের নাহি পারাবার। (ঐ)

পরিচ্ছেদ শেষে দোকানী ধরেছে সখীসংবাদ :

> আজ কৃষ্ণ চল হে নিকুঞ্জ বন
> প্রাণাহুতি যজ্ঞ করবেন রাই, লহ তারি নিমন্ত্রণ।

আর একজন দোকানী হুকা হাতে তাহার নিকট আসিয়া বলিল আমি একটা বিরহ গাই—

> তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে করে প্রাণ কুড়াবো প্রাণ
> তোমার রুষ্ট বাক্যে তুষ্ট হয়ে তপ্তজল করে যেন অনল নির্বাণ। (পৃ. ৫৪৩)

এ গ্রন্থের চতুর্দশ পরিচ্ছেদের শিরোনামা—বৈঠকী কথা : সঙ্গীত। এই পরিচ্ছেদ সংলাপ আকারে রচিত সঙ্গীতবিষয়ক প্রবন্ধ। সাধারণ পাঠককে সঙ্গীতচর্চা ও রাগতাল

সম্পর্কে কিছুটা ধারণা প্রদান এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। প্রথমাংশে কিঞ্চিৎ কৌতুক আছে।

"দিনমণির হিংগুল বর্ণে আকাশ ও বৃক্ষাদি সুশোভিত। যে স্থানে বাবুদিগের বৈঠক হয়, সে স্থানে কদর বৃক্ষের পত্রেতে সূর্য অস্তমিত—আভা চাকচিক্য করিতেছে। বনওয়ারীলাল বসিয়া বায়ু সেবন করিতেছেন ও কানেড়ার প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ গাইতেছেন,—

"খরজরি খবগান্ধার মধ্যম পঞ্চম নিষাদ এএ।"

কতিপয় রাস্তায় ছোঁড়ারা জমিল ও বাবুর হেঁড়ে গলা নির্গত স্বর শুনিয়া মুখ মুচ্কিয়া হাসিতে লাগিল। এ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া বনওয়ারীলাল ধ্রুপদ রাখিয়া দ্বিপদ অবলম্বন করতঃ তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময়ে তাহারা দৌড়িয়া পিট্টান দিল। ক্রমে ক্রমে সকল সঙ্গিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "আস্তে আজ্ঞা হউক গতির্গম।" স্তুতিবাক্যের স্রোতে বনওয়ারীর বদন হইতে হাসি ও জিহ্বার রস উদরোপরি লীলা করিতে লাগিল।

—ক। ভাল মহাশয়। আপনি তো সঙ্গীত শিখিয়াছেন, ইহার আদি কি?

বন। ঋষিরা ও গন্ধর্বেরা সঙ্গীতের আলোচনা করিতেন। বেদ সঙ্গীতের স্বরে পঠিত হইত। গন্ধর্ববিদ্যা সামবেদের অন্তর্গত। সঙ্গীতের নাম নাদবিদ্যা। নাদ সপ্ত প্রকার স্বরে বিভক্ত—খরজ, রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। এই সপ্তস্বরের তিন গ্রাম। উদারা নাভি হইতে, মুদারা গলা হইতে ও তারা মস্তক হইতে। বেদান্তে এই তিনের নাম—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত বলে।

"দুই স্বরের ব্যবধানে স্বরতি ও মুর্ছনা ও গমক। কোন গান এক সুরে হয় না। এক এক স্বরের আরোহী ও অবরোহী অর্থাৎ উর্দ্ধ ও নিম্ন গমন আছে। এ জন্য দুই তিন ও চারি ভাগের সীমা পর্যন্ত এক এক স্বর হইতে যাইতে পারে ও ঐ সীমা অতীত হইলে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। স্বরের কম্পনের নাম গমক ও এক স্বর হইতে অন্য স্বরে গমনের নাম মুর্ছনা। তাল একটি আঘাত ও একটি বিরাম। নানা তাল লঘু গুরু নিয়মের দ্বারা ধার্য হয়। মূর্ধা হইতে স্বর ও আঘাতের উৎপত্তি। নাদ মূর্ধার অতীত হইলে আত্মাতে লয় হয়। লয় অবস্থাতে নাদ নির্বাণ এবং রাগ ও তাল নাদের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রকারকদিগের নাম নারদ, তুম্বুরু হুহু ও ভারত। প্রাচীনমতে ছয় রাগ—শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ নটনারায়ণ। মতান্তরে রাগের নাম—ভৈঁরো, মালকোষ, হিন্দল, দীপক, শ্রী ও মেঘ। এক এক রাগের ছয়টি ছয়টি স্ত্রী। মুসলমান রাজাদিগের সময় সঙ্গীত আলোচনা হয়। স্বর যাহা ধার্য হইয়াছিল অর্থাৎ সা র গ ম, তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। মুসলমান রাজাদিগের সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক জন্মিয়াছিল—হরিদাস, তানসেন, গোপাল নায়েক, বপজুবাওরা, সদারং, আদারং। সেই সময়ে অনেক নূতন রাগিণী, নূতন প্রকার গান ও নূতন বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হয়।"

ক। আপনি কত রকম গান জানেন?

বন। ধরু, ধ্রুপদ, খেয়াল, সোরবন্দ, তেরাণা, চতুরঙ্গ, পাচরং, সসরং, নক্রগুল, টপ্পা, লাওনি, চিসতন, গজল, রেক্তা, রোবাই। ভারি ভারি তালও জানি ও সঙ্গত করিতে পারি। ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, লক্ষ্মীতাল, পাটতাল, সুরফক্তা, চৌতাল, ছোট চৌতাল, ঝাঁপতাল ও অন্যান্য নীচেকার তাল বাজাতে পারি।

খ। মহাশয় একটা গান।

বন। (মূলতান—মধ্যমান) "গোকুল গাঁওকো কোশরারে"—এমন সময় দুইজন লোক দৌড়াইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—"মহাশয় গো। রামরহিমবাবুকে তীরস্থ করা গেল" "অঁ্যা বলিস কি?" বলিয়া সকলে আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া বেগে চলিলেন।

জগৎ অদ্ভুত। এই পূর্ণিমা—এই অমাবশ্যা—এই আহ্লাদ, এই অনাহ্লাদ।" (আধ্যাত্মিকা, বৈঠকী কথা : সঙ্গীত, ঐ, পৃ. ৫৪৮-৫৪৯)

প্রায় সবসময়ই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্রসঙ্গ প্যারীচাঁদ লঘুমোড়কে উপস্থাপন করেন। বনওয়ারী-লালের অপর একদিনের সঙ্গীতচর্চার বর্ণনা লক্ষ্যযোগ্য:

যদিও রাগরাগিণী সময় অনুসারে সঙ্গীত, তথাচ গায়কের ও শ্রোতার ইচ্ছামত গান হয়। ইচ্ছা রাত্রিকে দিন, দিনকে রাত্রি করে।

বনওয়ারী ভোজনান্তে নিদ্রা না যাইয়া কদম্বতলে তাকিয়া ঠেসান দিয়া মিয়া মল্লারি "না, তা, না" দ্বারা আলাপ করিতেছেন। গলাটি একসুরো খরজে পূর্ণ। দুই মাগী জলের কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল আওয়াজ শুনিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। গায়ক রেগে মেগে বলিলেন,—"যাও, তোমরা কি তামাসা পেলে?' (ঐ, পৃ. ৫৫২)

অবশ্য পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে 'ভেঁরো রাগে' বৈরাগীর গান 'ধর্মচেতনার উদ্বোধক': "হর পঞ্চানন পিণাক পানে হে / ত্রাহি ত্রাহি এ অভাজনে হে"। (ঐ, পৃ. ৫৭১)।

৬

'বামাতোষিণী'র (১৮৮১) তৃতীয় পরিচ্ছেদে দুলের গান পুনশ্চ কৌতুকসঞ্চারী। রাত্রিতে দুলে বাগিতে আসিয়া তাড়ি খাইয়া গান করিত—

'বাবলার ফুল লো কানে লো দুলালি।
মুড়ি মুড়কির নাম রেখেছ রূপালি সোনালি ॥'

তাহার স্ত্রী স্বামীর গান শুনিয়া খিল খিল করিয়া হাসিত।
(বামাতোষিণী, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, ঐ, পৃ. ৬০২)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে মোক্ষবিলাসিনী ও কুলপাবন এবং ভবভাবিনী ও জীবনচেতনের বিবাহের পর—

নানা প্রকার বাদ্য—মৃদঙ্গ, বীণা, সেতারা, জলতরঙ্গ, নাসতরঙ্গ, এসরাজ বাদিত হইতে লাগিল। নানাপ্রকার গান-সঙ্গীত হইল। পিসিপেত্নী বাদ্য ও গানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করতঃ এই গান গান করিলেন :

মা না ভাল হলে ছা ভাল হয়না গো।
মা-ই তারিণী হয়ে ছাঁকে তরায় গো॥

বা, বা, চমৎকার! ওগো তোমাকে পিসিপেত্নী কে বলে? তুমি প্রকৃত উপদেশ-দায়িনী।" (ঐ, পৃ. ৬৪৬)

৭

গদ্যরচনায় অনিবার্য উপাদানরূপে প্যারীচাঁদ এভাবে বারংবার সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন, সঙ্গীতপ্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর চরিত্র নির্বাচনে যেমন নানাস্তর, গান নির্বাচনেও তেমনি নানা মাত্রা। নববাবু ও মদ্যপানের আসরে সখীসংবাদ, টপ্পা, খেউড়, কবিওয়ালাদের গান। সখীসংবাদে অবশ্য গাড়োয়ান ও দোকানদারদেরও সমান অধিকার। অন্যদিকে বেণীবাবু ও বনওয়ারীলালের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে শিল্পীর উৎকর্ষ অপেক্ষা শ্রোতাদের অপকর্ষ প্রকটতর। কিছু গানে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ মুখ্য। কাহিনী পরিবেশ ও উপস্থাপিত চরিত্র পরিস্ফুটনে প্যারীচাঁদ-ব্যবহৃত গান ও সঙ্গীতপ্রসঙ্গ প্রায় সর্বদাই বিশেষ সহায়ক হয়েছে। বিশেষতঃ সমকালীন সমাজচিত্র রচনায় গানের ব্যবহার যথেষ্ট সার্থক; একমাত্রিক চরিত্রেও তা কিঞ্চিৎ অধিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। এমন কি প্যারী-চাঁদ যখন গভীর ও গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত তখন চকিতে এক গীত-ধ্বনি পরিবেশকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। কোথাও কোথাও সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশের আগ্রহ তত্ত্ববক্তৃতার রূপ নিয়েছে; প্যারীচাঁদ সে সব ক্ষেত্রে সচেতনভাবে কৌতুক সংযোগ করে পরিবেশকে লঘু করতে চেয়েছেন। সে প্রয়াস খুব সার্থক হয়েছে বলা যায় না। তবে ঐ সব আলোচনা নিঃসন্দেহে প্যারীচাঁদের সঙ্গীতাগ্রহ ও অধিকারের স্মারক।

দুই

প্যারীচাঁদের সঙ্গীতচর্চার সর্বোত্তম নিদর্শন অবশ্য তাঁর 'গীতাঙ্কুর'। পয়ত্রিশটি গানের এই সংকলন প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। প্রত্যেকটি গানের শীর্ষে রাগরাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। সুরতালের তালিকা নিম্নরূপ :

গান সংখ্যা

১। রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি
২। রাগিণী বিভাস তাল আড়া
৩। রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল আড়া
৪। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া
৫। রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল
৬। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া

৭। নানা রাগ মিশ্রিত গীত—তাল আড়া
৮। রাগ মালকোষ—তাল আড়া
৯। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া
১০। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া
১১। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া
১২। রাগিণী পরজ—তাল আড়া
১৩। রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান
১৪। রাগিণী ললিত —তাল আড়া
১৫। রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া
১৬। রাগিণী আড়ানাবাহার—তাল তেওট
১৭। রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি
১৮। রাগিণী বিভাস—তাল মধ্যমান
১৯। রাগ ভৈঁরো—তাল আড়া
২০। রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া
২১। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া
২২। রাগিণী মূলতান—তাল আড়া
২৩। রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল মধ্যমান
২৪। রাগিণী আড়ানাবাহার—তাল মধ্যমান
২৫। রাগিণী সুরট—তাল আড়া
২৬। রাগিণী সুরট—তাল আড়া
২৭। রাগিণী বিভাস—তাল আড়া
২৮। রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান
২৯। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল মধ্যমান
৩০। রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল
৩১। রাগিণী সুহিনী—তাল মধ্যমান
৩২। রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল আড়া
৩৩। রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল মধ্যমান
৩৪। রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া
৩৫। রাগ শ্রী—তাল কাওয়ালি

লক্ষণীয় যে, 'রাগিণী ঝিঁজিট' ও 'তাল আড়া' প্যারীচাঁদের বিশেষ প্রিয়; ঝিঁজিট রাগিণীতে সাতটি ও আড়া তালে উনিশটি গান তিনি রচনা করেছেন এবং দ্বিতীয় প্রিয় তাল মধ্যমানে লিখেছেন আটটি গান।

উচচাঙ্গসঙ্গীত সাধনার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন প্যারীচাঁদের অভিষ্ট। সপ্তম সংখ্যক গানে তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় বিধৃত। ঐ গানে নানা রাগরাগিণী চর্চার তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন ইমনকল্যাণ বিহাগ, ভৈরব, ললিত, বিভাস, গৌড় সারঙ্গ, মূলতান ও পুরিয়া। একটি কি দুটি চরণের প্রতিটি রাগরাগিণীর অবলম্বন হেতু নির্দেশ করে প্যারীচাঁদ উল্লেখ করেছেন 'গ্রাম সুর মান নাহি প্রয়োজন'। গানটির সুর বৈশিষ্ট্য : এটি 'নানা রাগ মিশ্রিত গীত'। সম্ভবতঃ যখন যে চরণে যে রাগ/রাগিণীর উল্লেখ হচ্ছে সে চরণ সেই বৈশিষ্ট্যে গাইতে হবে।

এমন কল্যাণ হইবে কেমন।
কেমনে করি আমি এই সাধন।১।

কে দারা কে সুত দারা অঙ্গন
　　সংসার অসার ভ্রম দরশন।২।
বিহাগ ত্যাগ অসার চিন্তন
　　চরমে ইষ্টলাভ কর মনন ।৩।
ভৈরব ধ্যানে কর তাঁহার ধ্যান।
　　ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম কর অনুষ্ঠান।৪।
ললিত স্তবে গলিত হও মন।
　　প্রেম উদয়ে সুখের আগমন।৫।
বিভাস প্রকাশ সেই নিরঞ্জন।
　　মুদিত নয়নে কি হবে দরশন।৬।
গৌড় সারঙ্গে তাঁর সংকীর্তন
　　এক মন হয়ে কর পুনঃপুন।৭।
মূলতান অকপট আচরণ।
　　গ্রাম স্বর মান নাহি প্রয়োজন।৮।
পুরিয়া মনের সাধ সংপূরণ
　　হৃদি চিত্ত মন কর হে অর্পণ।।৯।

এই গানের মতই ইহজাগতিকতা-অতিক্রান্ত আত্মিক কল্যাণ ও 'ঈশ্বর' চিন্তাই প্যারীচাঁদের প্রতিটি গানের বৈশিষ্ট্য।

১ সংখ্যক গানে প্যারীচাঁদ 'ভবের ভৌতিক ভাব' ভেবে 'কাতর'; কেননা এখানে 'মন সদা উচাটন, বিষয়েতে সদা মন।' এ অবস্থা থেকে 'ত্রাণে'র জন্য তিনি 'অমূল্য ধন' 'সারাৎসার পরাৎপর' 'পরমেশ্বর' 'বিশ্বেশ্বরে'র শরণার্থী।

২ সংখ্যক গানে রেচক পূরক নয় 'মনোযোগে মনযোগ' সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন প্যারীচাঁদ।

৩ সংখ্যক গানের বক্তব্য: 'প্রেমময় পাবে যদি হও প্রেমময় / প্রেম গতি প্রেম মুক্তি প্রেম সর্বাশ্রয়'। প্রেমের দ্বারা মৃত্যুভয় উত্তরণ সম্ভব।

৪ সংখ্যক গানে প্রার্থনা: 'মানবের যত ক্লেশ তুমি হে করহ শেষ'।

৫ সংখ্যক গানে 'মন শোধনের' সাধনার কথা। ইহজগতে 'কামের কুমতি' জনিত 'যন্ত্রণা'—মুক্তির লক্ষ্যে 'কর্ম্মজ' ও 'মনজ' পাপ থেকে মন শুদ্ধ করতে হবে। উপরন্তু—

ক্রোধ প্রতি কর ক্রোধ, ক্ষমা অস্ত্রে কর রোধ
　নম্রতার অগ্রে অহঙ্কারের মরণ।

৬ সংখ্যক গানের প্রথম দশ চরণে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্যর্থ জীবনের জন্য খেদ। জাগতিক অর্থে জীবন ব্যর্থ ছিল না, ছিল 'বুদ্ধি বল অর্থ' কিন্তু সে সব 'ইন্দ্রিয় সুখে'র জন্য অপব্যয়িত।

ইন্দ্রিয় সুখেতে কাল গেল মোর সব কাল
　অবশেষে হল কাল, কাল দরশন।

শেষ দুই চরণে 'পরাৎপরের' 'অপার করুণার আস্থা রেখে খেদ সংবরণের জন্য বিলাপীকে কবি উপদেশ দিয়েছেন।

৮ সংখ্যক গানে নিরঞ্জনের ভজনায় মৃত্যুভয় অতিক্রমের কথা বলা হয়েছে, কেননা—

ভ্রান্ত অশান্ত নর কভু না পায় অন্ত।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে সর্বদা প্রাণান্ত।

৯ সংখ্যক গানে জাগতিক রাগ, দ্বেষ, অহংকার, পাপ, ক্লেশ সম্পদ থেকে মুক্তিপথ রূপে বিপদকে দেখা হচ্ছে এই বিশ্বাসে যে 'চরণে হবে নিস্তার এজন্য বিপদ'। এখানে প্রার্থনা : 'বিপদে সম্পদে যেন ভাবি ঐ পদ'।

১০ সংখ্যক গান পতিহারা রমণীর প্রতি উপদেশ—

জগৎ পতি করি পতি হর স্বীয় দুর্গতি
পুনর্ব্বার পাবে পতি, গেলে লোকান্তরে।

১১ সংখ্যক গানে এই জাগতিক সংশয় ব্যক্ত হয়েছে—

কত কুসঙ্গ তরঙ্গ উঠিছে যেন মাতঙ্গ
এ আতঙ্ক করে ভঙ্গ ভরসা আমার।

১২ সংখ্যক গানের ইহলোক অতিক্রান্ত পরলোকচিন্তাই মুখ্য—

হলে প্রেমের প্লাবন করে তারা দরশন
নিস্ফল নির্মল ব্রহ্ম আলোক আলোক
যদি চাহ সে আলোক, ভাব সদা পরলোক
কি হইবে ভাবিলে কেবল ইহলোক॥

১৩ সংখ্যক গানে 'মদে পতিত' জনের প্রতি উত্তরণের আহ্বান।

১৪ সংখ্যক গানে প্রকৃতিতে ঈশ্বরের অপার প্রেম ও করুণার উপস্থিতির উল্লেখ করে বিশ্বাধার-সেবার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

১৫ সংখ্যক গানে মানুষের ইহজাগতিক মোহমুক্তির জন্য ধর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

১৬ সংখ্যক গান 'আত্মার পতন' রোধ করার জন্য পাপ ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অসামান্য 'রণে'র আহ্বান।

১৭ সংখ্যক গানেও ইহজাগতিকতার অসারতার কথা—

'কেন হে ভৌতিকামোদ কেন মদে গদগদ'।

১৮ সংখ্যক গানে পরহিতব্রত গ্রহণের আহ্বান আছে। আত্মসুখচর্চার পরিবর্তে স্বামীহারা রমণী, অনাথ শিশু, অনাহারে 'জীর্ণশীর্ণ কলেবর' মানুষ, রোগ শোক ক্লিষ্ট মানুষ, কুটির চাল বঞ্চিত নরনারীর সেবার জন্য সুযোগপ্রাপ্তকে তিনি এগিয়ে আসতে বলছেন; অধর্ম এবং অশিক্ষামোচনও লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য বলে উল্লেখ করছেন; বলছেন, সমগ্র লক্ষ্যে 'শ্রম' ও 'উপদেশ' প্রদানের জন্য ক্লেশ স্বীকারই কর্তব্য।

১৯ সংখ্যক গানে মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খলার প্রতি নির্দেশ করে পৃথিবীতে মানুষের পরহিত ব্রত গ্রহণের জন্য পুনরায় আহ্বান জানানো হয়েছে।

২০ সংখ্যক গানে 'মনজ কর্মজ পাপ' থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধাচারী হওয়ার উপদেশ আছে।

২১ সংখ্যক গানে পুনশ্চ 'পরহিত অনুরোধ' ব্যক্ত হয়েছে।

২২ সংখ্যক গানের বক্তব্য: 'ভক্তিতেই পাবে মুক্তি, এই স্থির কর মন'।

২৩ সংখ্যক গান ঐ ভক্তিগীতি, অনুপ্রাস বহুল।

২৪ সংখ্যক গানে আহ্বান ক্রমাগত 'মন্‌জেল মন্‌জেল' যাত্রার আহ্বান।

২৫ সংখ্যক গানে পরমশিবত্ব তত্ত্বের কথা।

২৬ সংখ্যক গানে অনিত্য সুখ পরিহার করে মঙ্গল সাধনের পথে যাবার উপদেশ আছে।

২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ও ৩৩ সংখ্যক গান বিশ্বেশ্বর স্তুতি।

৩০ সংখ্যক গানে 'ভব ভাব ব্যর্থভাব ক্রমে ক্রমে দূরিত' হয়ে 'ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ সদানন্দ লাভের' কথা ব্যক্ত হয়েছে।

৩২ সংখ্যক গানে অশ্রুকে আনন্দাশ্রুতে রূপান্তরের সাধ—

তবে কেন নয়নের বারি নিবারি
যদি এই বারিতে পাই সেইরূপের মাধুরী।

৩৪ ও ৩৫ সংখ্যক গানে বৈষ্ণবাদর্শ সংযুক্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে ৩৪ সংখ্যক গানে আছে নাটকীয়তা—

ওরে বৃন্দাবনের লোক
দেখারে আমাকে তোরা আলোকের আলোক।

৩৫ সংখ্যক গানে বৈষ্ণবচিন্তা প্রত্যক্ষতর—

প্রেম নগরে চল যাই
সেই প্রেমময় প্রেমেশ্বরের দিব হে দোহাই
প্রেমেতে মগন হব প্রেমামৃত পান করিব
প্রেমানন্দ হইয়া ভ্রমিব ঠাঁই ঠাঁই।

এই পঁয়ত্রিশটি গানে সমকালীন রচনারীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হলেও ছন্দ মিল অনুপ্রাস ও ভাষা ব্যবহারে প্যারীচাঁদ দক্ষতার অনায়াস স্বাক্ষর রেখেছেন। অনুপ্রাসের প্রয়োগে কোথাও কোথাও ঈশ্বরগুপ্তের কথা মনে পড়ে তবে সেই সঙ্গে প্যারীচাঁদের সংযমও উল্লেখযোগ্য। গানে অভিব্যক্ত ভাব প্যারীচাঁদের তৎকালীন ব্যক্তিমানসের কথা স্মরণে রেখেই বিবেচ্য এবং তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা বিষয়ক বাংলা ও ইংরেজী গদ্যরচনার সূত্রেই এগুলো পঠনীয়।

১২৬৮ সালে (১৮৬১) প্রথম প্রকাশিত 'গীতাঙ্কুরের' তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বডেলিন গ্রন্থাগার থেকে ১৯৭০ সনে আমি এই গ্রন্থের একটি জেরক্স কপি সংগ্রহ করি। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :

"গীতাঙ্কুর।/শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত।/তৃতীয় সংস্করণ।/কলিকাতা।/শ্রী যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী। সন ১২৯৯ সাল।" আখ্যানপত্রের পূর্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে :

BHOWANIPORE :
B. M. BOSE : SAPTAHIK SAMBAD PRESS
1892.

ঐ সংস্করণের পাঠ অনুযায়ী এই আলোচনার পরিশিষ্টে গীতাঙ্কুরের পঁয়ত্রিশটি গান পুনর্মুদ্রিত হল।

উল্লেখসূত্র

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ২১, পঞ্চম সংস্করণ ১৩৬২, কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ১৯৫৯, বাংলাসাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র, সাহিত্য পত্রিকা (সম্পাদক : মুহম্মদ আবদুল হাই), ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা বর্ষা ১৩৬৬।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ১৯৬৫, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ ১৯৭০।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ১৯৬৭, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, ঢাকা : কথাকলি ; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭০ পাণ্ডুলিপি।

প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর), ১৮৬১, গীতাঙ্কুর, তৃতীয় সংস্করণ ১২৯৯, কলকাতা : শ্রীযোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং লাইব্রেরী।

প্যারীচাঁদ মিত্র, ১৮৮১, *On the Soul*, Calcutta.

পরিশিষ্ট

গীতাঙ্কুর

১। **রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালী।**

ত্রাণ কর পরমেশ্বর, ওহে বিশ্বেশ্বর।
ভবের ভৌতিক ভাব ভাবিয়া হই কাতর।
দয়া কর মোর প্রতি, আমি অতি মূঢ়মতি,
করজোড়ে করি স্তুতি, সদা পাপে জরজর।
মন সদা উচাটন, বিষয়েতে সদা মন,
তুমি হে অমূল্য ধন, সারাৎসার পরাৎপর ॥

২। **রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।**

মনোযোগে মনোযোগ কর হে সাধন।
এ নয় অসাধ্য সাধন।
কি প্রয়োজন আসন, কি প্রয়োজন বন্ধন
রেচক পূরকে নাহি কিছু প্রয়োজন।
অনুতাপ-অগ্নি জ্বালি, চিত্ত মধ্যে দেহ ঢালি,
শ্রদ্ধা ভক্তি হবি দিয়া কর হে দাহন।
মন অতি সমল, কর তারে নির্ম্মল
পাইবে হে বিমল অমূল্য রতন ॥

৩। **রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল আড়া।**

প্রেমময় পাবে যদি, হও প্রেমময়।
প্রেম গতি প্রেম মুক্তি প্রেম সর্ব্বাশ্রয়।
সৃজন পালন, জীবন মরণ, তারণ কারণ সব প্রেমময়।
কোথায় অশিব, সর্ব্বত্রেতে শিব, এ প্রেমে কি জীব, উদ্ধার না হয়।
যিনি প্রেমাধার, নিকটে তাঁহার, মাগ প্রেমধার, পাইবে নিশ্চয়।
পাপ বিসর্জ্জন, অকপট মন, তাঁহাতে অর্পণ, কর বিনিময়।
আত্মবৎ ভাব, হইবে স্বভাব, মনের কুভাব, যাইবে নিশ্চয়।
কামাদি প্রবল, দেখি প্রেমবল, ক্রমশঃ দুর্ব্বল, হবে অতিশয়।
মরণের ভয়, হইবে অভয়, সব সুখময়, পাইবে আলয় ॥

৪। **রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া।**

তব অর্চ্চণার কি ফল, মন শান্ত হয় আর বাড়ে ধর্ম্মবল।
ত্রাসিত তাপিত মন, সুখী না হয় কখন,
লইলে তব স্মরণ, আনন্দ বিমল।
শোকেতে মোহিত জীব, তব ধ্যানে সজীব,
চিত্তের সান্ত্বনা শিব, তোমাতে কেবল।
মানবের যত ক্লেশ, তুমি হে করহ শেষ,
কৃপাকর কৃপাশেষ, দেহ কৃপাবল।
পাপেতে পতিত অতি, অগতির তুমি গতি,
কি হইবে মম গতি, ভাবিয়া বিহ্বল।
তব প্রেমে এ নয়ন, যেন করে বরিষণ,
ভক্তি অশ্রু নিরঞ্জন, নিস্পাপ নির্ম্মল।।

৫। **রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।**

মন শোধন সাধন কর সযতন।
চিত্ত নির্ম্মল হইলে ব্রহ্ম দরশন।
কামের কুমতি নানা, পাইবে ঘোর যন্ত্রণা,
নির্ম্মল না হলে নির্ম্মল পাইবে কেমন।
কর্ম্মজ পাপ যেমন, মনজ পাপ তেমন,
কায় মনে শুদ্ধ হয়ে কর তাঁর স্মরণ।
ক্রোধ প্রতি কর ক্রোধ, ক্ষমা অস্ত্রে কর রোধ,
নম্রতার অগ্রে অহঙ্কারের মরণ।।

৬। **রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া।**

বৃথা গেলরে জীবন।
কি বলিব জিজ্ঞাসিলে জীবনের জীবন।
পেয়ে বুদ্ধি বল অর্থ, করিলাম অনর্থ,
বল বুদ্ধি গেল ব্যর্থ, গেল সব ধন।
ইন্দ্রিয় সুখেতে কাল, গেল মোর সব কাল,
অবশেষে হলো কাল, কাল দরশন।
না হইল পরহিত, যা হইল অনুচিত,
পাইব হে সমুচিত, দহে মম মন।
নাহি কিছু সম্বল, ধ্বংশ হলো বুদ্ধি বল,
কি করি এখন বল, নিকট নিধন।
খেদ সম্বরহ নর, ভাব সেই পরাৎপর,
অপার করুণা তাঁর, দারিদ্র্য ভঞ্জন।।

৭। **নানা রাগ মিশ্রিত গীত—তাল আড়া।**

এ মন কল্যাণ হইবে কেমন।
কেমনে করি আমি এই সাধন। ১।

কে দারা কে সুত মায়া অঞ্জন।
সংসার অসার ভ্রম দরশন। ২।
বিহাগ ত্যাগ অসার চিন্তন।
চরমে ইষ্ট লাভ কর মনন। ৩।
ভৈরব ধ্যানে কর তাঁহার ধ্যান।
ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম কর অনুষ্ঠান। ৪।
ললিত স্তবে গলিত হও মন।
প্রেম উদয়ে সুখের আগমন। ৫।
বিভাস প্রকাশ সেই নিরঞ্জন।
মুদিত নয়নে কি হবে দরশন। ৬।
গৌড় সারঙ্গে তাঁর সংকীর্ত্তন।
এক মন হয়ে কর পুনঃপুন। ৭।
মুলতান অকপট আচরণ।
গ্রাম স্বর মান নাহি প্রয়োজন। ৮।
পূরিয়া মনের সাধ সংপূরণ।
হৃদি চিত্ত মন কর হে অর্পণ।। ৯।

৮। **রাগ মালকোষ—তাল আড়া।**

ভ্রান্ত অশান্ত নর কভু না পায় অন্ত।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে সর্ব্বদা প্রাণান্ত।
জীবের নিধন, সম্ভবে কেমন,
অবশেষে জীব শিব হইবে নিতান্ত।
কে বলে মরণ, লোকান্তে গমন,
মনের অগোচর নহে এ বৃত্তান্ত।
পাপ পূণ্য ফল, ভিন্ন ভিন্ন স্থল,
শুভাশুভ কর্ম্ম গুণে পাইবে অভ্রান্ত।
ভাই বন্ধু যত, হবে সমাগত, মিলিবে তাঁহারা যদি হয় একান্ত।
ধর্ম্মের কি ভয়, হবে সদা জয়,
নিশ্চয় পাইবে সুখ অসীম অনন্ত।
পাপী স্বীয় পাপ, দহি অনুতাপ,
তাঁহার কৃপা-গুণে শেষে হবে ক্ষান্ত।
দুঃখ অকারণ, কর কি কারণ,
ভজি সত্য নিরঞ্জন, নাশ হে কৃতান্ত।।

৯। **রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া।**

বিপদ কে বলে বিপদ।
বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ।
তুমি হে প্রেম আধার, প্রেম করহ বিস্তার,
চরমে হবে নিস্তার, এ জন্য বিপদ।
কত রাগ কত দ্বেষ, অহঙ্কার অশেষ,
পাপের দারুণ ক্লেশ, বাড়ায় সম্পদ।

বিপদ ঔষধি ধন, মন কর সংশোধন,
করিয়া পাপ নিধন, দেয় নিরাপদ্।
তুমি হে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ,
বিপদে সম্পদে যেন ভাবি ঐ পদ।।

১০। **রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া।**

কে গো রোদন করে।
সকঙ্কণ করে মারে মস্তক উপরে।
একাকিনী চন্দ্রাননী, উন্মাদিনী পাগলিনী,
এ বনি করে কে ধনী, পরাণ শিহরে।
সিন্দূর অঞ্জন মিশি, মেঘে তড়িতের হাসি,
ধারা বহে পড়ি খসি, নয়নের নীরে।
এলোকেশী এলোমনা, বিগত-ধৈর্য্য-বন্ধনা,
শোকেতে হয়ে উন্মনা, মগনা কাতরে।
জিজ্ঞাসিলে রামা কহে, পতি শোকে হৃদি দহে,
কেন শ্বাস আর বহে, এ মিথ্যা শরীরে।
পতি মোর প্রাণ ধন, বৃথা মোর এ জীবন,
মরিলে বাঁচে জীবন, এ শোক সাগরে।
স্থির হও গুণবতী, পিতা পুত্র ভাই পতি,
ব্রহ্মাণ্ডের তিনি পতি, ভাব হে তাঁহারে।
জগৎ পতি করি পতি, হর স্বীয় দুর্গতি,
পুনর্ব্বার পাবে পতি, গেলে লোকান্তরে।।

১১। **রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।**

দেখি ঘোর অন্ধকার।
তরজে গরজে তম-মেঘ বারম্বার।
পাপ প্রচণ্ড পবন, ছিন্ন ভিন্ন করে মন,
মত্ততা-তড়িতে বাড়ে কুমতি বিকার।
অহঙ্কার বজ্র শব্দ, নম্রতা হইছে স্তব্ধ,
শিহরে শুদ্ধতা ভয়ে হইয়া অসার।
কত কুসঙ্গ তরঙ্গ, উঠিছে যেন মাতঙ্গ,
এ আতঙ্ক করে ভঙ্গ ভরসা আমার।
বিপদের নাহি পার, কেমনে হইব পার,
তোমার কৃপা অপার তুমি কর্ণধার।।

১২। **রাগিণী পরজ—তাল আড়া।**

কেমনে পাইব সে আলোক।
যে আলোকে পরিত্রাণ হয় ইহলোক।

যে আলোকে লয়ে যায়, দেয় সত্য প্রেমালয়,
সে আলয়ে বিরাজে যতেক পুণ্যশ্লোক।
কিন্নর অপ্সর নানা, সিদ্ধ সাধু অগণনা,
সুখ রসে ভাসে সদা নাহি দুঃখ শোক।
সবাকার এই চিত, কিসে হবে পরহিত,
প্রেম বিগলিত হয়ে ভ্রমে ঐ লোক।
হলে প্রেমের প্লাবন, করে তারা দরশন,
নিষ্কল নির্ম্মল ব্রহ্ম আলোক আলোক।
যদি চাহ সে আলোক, ভাব সদা পরলোক,
কি হইবে ভাবিলে কেবল ইহলোক॥

১৩। **রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।**

আর কেন হও বিমোহিত, মদে পতিত।
কাল কাল না দেখিবে কর যা উচিত।
মুখেতে বলা ঈশ্বর, যদিও এ শুভ কর,
কেবল এই রবে না হইবে রক্ষিত।
কি করিবে দারা পুত্র, চিত্ত কর্ম্ম মূল সূত্র।
চিত্তের সরল গুণে তরিবে নিশ্চিত।
অকপট ভক্তি কর, ত্যাজ বাহ্য আড়ম্বর,
ইহাতে তাঁহার প্রীতি, এই হে বিহিত॥

১৪। **রাগিণী ললিত—তাল আড়া।**

কর স্তব নর সব কর তাঁর সংকীর্ত্তন।
সেই নামে পরিণামে জুড়াইবে এ জীবন।
সমীরণ মন্দ মন্দ, বহে হয়ে সানন্দ,
বিকশিত পুষ্প গন্ধ, করে বিতরণ।
বন উপবন শোভা, মিলিত অরুণ আভা,
কি আশ্চর্য্য মন লোভা, নয়ন রঞ্জন।
ডাকে নানা পক্ষিগণ, কত স্বর আলাপন,
যোগীর ধ্যান-ভঞ্জন, শ্রবণ মোহন।
আকাশের রম্য দৃষ্টি, প্রেমে পুলকিত সৃষ্টি,
দেখি এত প্রেম বৃষ্টি, স্থির কি কারণ।
উঠ উঠ সব নর, করপুটে স্তব কর,
সেবিলে সে বিশ্বাধার, সুখেতে মরণ॥

১৫। **রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া।**

ওহে ধর্ম্ম ব্রত জন মৌন দেখি কি কারণ।
চিত্তের অস্থৈর্য্য তুমি আশু কর নিবারণ।

দেখি পাপের উন্নতি, পুণ্যের অধম গতি,
বুঝি হইতেছে মতি, ধর্ম্মের কি প্রয়োজন।
পাপী নানা সুখ ভোগে, আনন্দে বাড়ে অরোগে,
সদা থাকে যোগে যাগে, শুষ্ক ধর্ম্ম পরায়ণ।
কিন্তু দেখ মনে ভেবে, আত্মা নাহি ধ্বংস হবে,
থাকিলে পুণ্য প্রভাবে, পাবে সুখ-নিকেতন।
পাপ পুণ্য ফলাফল, এখানে নহে কেবল,
এ হয় পরীক্ষা স্থল, এই এর নিদর্শন।
সব দণ্ড পুরস্কার, এখানে নহে বিস্তার,
এলোকে হলে নিস্তার, পরলোক কি কারণ।
ক্লেশে থাকে যেই জন, ধর্ম্ম তাঁর আভরণ,
মনের সন্তোষ ধন, কভু না হয় নিধন।
বাড়িলে সে ধনাকর, শোভাকর মনোহর,
দুঃখ শোক নাশকর, সুখকর অনুক্ষণ।
কঠোরেতে বাড়ে ধর্ম্ম, বৈভবে বৃদ্ধি অধর্ম্ম,
পরি দৃঢ়তার বর্ম্ম, ক্লেশ কর সম্বরণ।
ক্লেশ ধর্ম্ম পুরস্কার, ধন পাপ তিরস্কার,
বুঝি এই পরিষ্কার, সদা ধর্ম্মে দেও মন ॥

১৬। **রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল তেওট।**

সাজ সাজ সাজ সমরে।
আত্মা ভিতরে প্রবেশে পাপ পিশাচ সত্বরে।
কুপ্রবৃত্তি সেনাপতি, সঙ্গেতে দুর্ব্বল মতি,
ধাইছে বেগেতে অতি, মারে ছলনা শরে।
পশ্চাতে আইসে কাম, সদা ব্যস্ত নিজ কাম,
অশুদ্ধতা অবিরাম, সকটাক্ষে বিস্তারে।
ক্রোধ চলে তার পর, ভয়ানক ঘোরতর,
কম্পান্বিত কলেবর, মার মার চীৎকারে।
লোভ যাহা পায় ধরে, একেবারে গ্রাস করে,
কর দিয়া স্বউদরে, মুখ সদা প্রসারে।
মদ মত্তে হয়ে মদ, উন্মত্ত স্ব সম্পদ,
পান করি মদমদ, করে করে প্রহারে।
শেষে আসে অহঙ্কার, উগ্র মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
ব্রহ্মাণ্ডই তুচ্ছ তার, তার শক্তি কে ধরে।
উঠ উঠ কর রণ, এ নহে সামান্য রণ, এ রণে
হলে মরণ হারইবে অমরে।
শরীর হলে পতন, সে পতন কি পতন,
আত্মার হলে পতন, মজিবে একেবারে।

১৭। **রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।**

ওহে কেন অচেতন।
জাননা কি কালান্তরে লোকান্তরে গমন।

কেন অলস বিলাস, কেন লালস অভ্যাস,
কেন নিশ্বাস বিশ্বাস, প্রকাশ সার চিন্তন।
কেন হে ভৌতিকামোদ, কেন মদে গদ গদ,
কেন ত্যজ সারাস্বাদ, সর্ব্ব-শান্তি ব্রহ্ম জ্ঞান।
কেন বাহ্য আড়ম্বর, কেন অসারে তৎপর,
কেন সেই পরাৎপর, না কর হৃদয় ধ্যান॥

১৮। **রাগিণী বিভাস—তাল মধ্যমান।**

আর কেন নয়ন মুদিত। চল চল ধর্ম্মক্ষেত্রে কর যা উচিত।
কোথায় বা অনাহার, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর,
ভ্রমে প্রাণী শীত বৃষ্টি হয়ে আচ্ছাদিত।
কোথায় বা স্বামী হীনা, ভোগে রমণী যন্ত্রণা,
কোথায় বা পিতৃমৃত্যে শিশু অনাশ্রিত।
কোথায় বা রোগ ক্লেশ, অনুপায়ে অবিশেষ,
কোথায় কুলীন চাল অনেকে বঞ্চিত
কোথায় বা শোকানল, দহে সদা হৃদিদল,
শ্রাবণের ধারা বহে চক্ষু বিমোহিত।
কোথায় কলুষ রাশি, গ্রাস করে ধর্ম্মশশী,
কোথায় মূর্খতা জন্য কর্ম্ম বিপরীত।
দান শ্রম উপদেশ, ক্লেশ-বিঘ্ন-পাপ-শেষ,
সাধনা হইবে হলে চিত্তেতে পীড়িত।
পরদুঃখ পরমুখ, আত্মদুঃখ আত্মসুখ,
এ বিধায় অনুষ্ঠানে স্বর্গীয় পীরিত॥

১৯। **রাগ ভৈঁরো—তাল আড়া।**

জ্ঞানময় নিরাময় সুখময় সর্ব্বাশ্রয়।
বিচিত্র রচনা তব প্রেমময় অভিপ্রায়।
দেখিলে নভোমণ্ডল, এ আশ্চর্য্য ভূমণ্ডল,
জ্ঞান হয় কুমণ্ডল, এক পার্শ্বে রয়।
কত গ্রহ দিবাকর, কত তারা শশধর,
কত কেতু জ্যোতিষ্কর, সব প্রাণিময়।
কি কৌশলে নিরমিত, কি কৌশলে নিয়োজিত,
কি কৌশলে নির্ব্বাহিত, বদ্ধ শৃঙ্খলায়।
করিয়াছ যে নিয়ম, নাহি তার ব্যতিক্রম,
তোমার নিয়ম-ভ্রম, দৃষ্টি নাহি হয়।
সৃষ্টি অসংখ্য অসীমা, অপার তব মহিমা,
তোমাতে তব উপমা, সর্ব্ব-শক্তিময়।
অগণ্য তব সৃজন, অগণ্য তব পালন,
অগণ্য কৃপা অর্পণ, কর কৃপাময়।
কত ক্ষমা কর দান, মানবের নাহি জ্ঞান,
তোমাতে ক্রোধ বিধান, তুমি ক্ষমাময়।

ক্লেশ রোগ মৃত্যু শোক, শিব পায় এই লোক,
না ভাবিয়া পরলোক, সুস্থির ত্বরায়।
কত কর পর্যটন, দিতে সুখ অনুক্ষণ,
তব নিয়ম ভঞ্জন, ক্লেশ নর পায়।
সব জীবে ক্রোড়ে কর, মাতাধিক স্নেহ ধর,
মহা পাপীকে উদ্ধার, বিহিত সময়।
মানবের হিত জন্য, দেহ করিয়াছ জন্য,
দিবে সুখ অসামান্য, গেলে স্বর্গালয়।।

২০। **রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।**

একি দেখি ভয়ঙ্কর।
যেন কে প্রহারে মোরে কাঁপি থরথর।
মনজ কর্ম্মজ পাপ, দেয় নিদারুণ তাপ,
আপন স্মরণ হলো ঘোর দণ্ডধর।
যাহা ছিল অপ্রকাশ, সে এক্ষণে সপ্রকাশ
এ জানিলে কে করিত পাপ ঘোরতর।
পর বনিতা গমন, পর বিষয় হরণ
পর পীড়নে পীড়ন, সদা জরজর।
যেমন মন আমার, তেমন হলো আকার
সঙ্গিগণে দেখি যেন হর-অনুচর।
ভয়ানক এই লোক, আর কোথায় নরক,
অসহ্য যন্ত্রণা ভোগে অসীম কাতর।
চারি দিক অন্ধকার, কেমনে হবে, সুসার,
অসার কর্ম্মের ফল অবশ্য অসার।
উর্দ্ধেতে করে গমন, পুণ্যবান্ এক জন,
নিকটে আনিয়া বলে হয়ে স্থিরতর।
অন্যের পাপ মোচন, অন্যকে পুণ্য প্রদান,
কাহার ক্ষমতা নাহি সৃষ্টির ভিতর।
শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধাচার, ইহাতে আশু নিস্তার,
তা না হলে কর্ম্ম দোষে যন্ত্রণা বিস্তর।
দয়াময় ক্ষমাসিন্ধু, দেন সবে কৃপা ইন্দু,
এ কারণ পাপী তাপী হয় কালান্তর।
হয়োনা সান্ত্বনান্তর, ভবান্তর গত্যন্তর,
যদি পাবে হও নিরন্তর তাপান্তর।।

২১। **রাগিণী ঝিঁজিট—তাল আড়া**

কত পাইবে রতন, ওহে ধর্ম্মপরায়ণ,
যখন হইবে মুক্ত শরীরবন্ধন।
প্রজ্বলিত অনুতাপ, নাশিয়াছে তব পাপ,
এমন পুণ্য প্রতাপ, সুখেতে গমন।

দূরে যাবে রোগ শোক, সুখময় নানা লোক,
শোভিত সত্য আলোক, হবে দরশন।
কেহ না করিবে রোধ, ন বিবাদ ন বিরোধ,
পরহিত অনুরোধ, সদা বরিষণ।
কত দৃশ্য মনোহর, কত ধ্বনি সুখকর,
কত গন্ধ মত্তকর, পাবে অনুক্ষণ।
যেমন হয়েছ নত, হইবে হে উন্নত,
জ্ঞান প্রেমে ক্রমাগত, ক্রমশঃ বর্দ্ধন।
দয়ালু দেবতা যত, মিলিবে প্রফুল্ল চিত,
সঙ্কীর্ত্তন প্রেমামৃত, থাকিবে মগন,।
দেখিবে হে নিরঞ্জন, সর্ব্ব তাপ বিমোচন,
দুর্লভ হৃদয় ধন, রতন-রতন ॥

২২। **রাগিণী মূলতান—তাল আড়া।**

সুখ ধামে যাবে যদি কর আয়োজন।
ভক্তি কাণ্ডারী হইলে অভ্রান্তে গমন।
ভক্তি কভু নহে বাম, মননেত্রে অবিরাম,
এই খানে সেই ধাম, করাই বে প্রদর্শন।
ভক্তির করহ যুক্তি, ভক্তির অপার শক্তি,
ভক্তিতেই পাবে মুক্তি, এই স্থির কর মন॥

২৩। **রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল মধ্যমান।**

কৃপাময় কৃপা কর এ অভাজনে।
অন্তরেতে সুখস্রোত ভাসমান তব ধ্যানে।
নানা তরঙ্গার রঙ্গ, একাগমে অন্য ভঙ্গ,
ছাড়িলে তোমার সঙ্গ, কুরঙ্গ তাড়িত বনে॥

২৪। **রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল মধ্যমান।**

মন্‌জেল মন্‌জেল চলে চল ভাই
মনে করো না আগ মন্‌জেল নাই।
যত মন্‌জেল যাবে, দুখ বিগত হইবে,
সুখাকাশ প্রকাশিবে, দিবা রাত্র নাই।
ছাড়িলে পার্থিব ভাব, ঘুচিবে সব অভাব,
ভাব ভাবাতীত ভাব, বাড়িবে সদাই॥

২৫। **রাগিণী সুরট—তাল আড়া।**

কেন বাহিরে ভ্রমণ? ইদং তীর্থমিদং
কার্য্যং নানা ধর্ম্ম সৃজন।
অন্তরেতে প্রবেশিলে ভাবাতীত দরশন।

মত বিশ্বাসের শেষ, কে করিতে পারে শেষ,
বাহ্য গুরু আচার্য্যের নানা মত বরিষণ।
নানাত্ব একত্ব হবে, আত্মময় হবে যবে,
আত্মারি স্বর্গেতে হবে তর্ক নরক বিলীন।
অনন্তং সত্যং জ্ঞানং, অনন্তং সত্যং ধ্যানং,
অনন্ত আত্মার শক্তি স্বশক্তিতে বর্দ্ধন।
হইলে হে জীবন শিব, দেখিবে হে সব শিব,
পরমশিবত্ব তত্ত্ব নিয়ত নিধিধ্যাসন।।

২৬। **রাগিণী সুরট—তাল আড়া।**

মঙ্গল সাধন কর ভাবিয়া মঙ্গলময়।
মঙ্গলে পূরিবে চিত্ত দূরে যাবে দূরাশয়।
পর দুঃখ বিমোচন, পর সুখ বিবর্দ্ধন,
প্রকৃত মঙ্গল এই চরমে সম্বল হয়।
আর যা ভাব মঙ্গল, সে কেবল অমঙ্গল,
অনিত্য সুখেতে নিত্য না পাবে আনন্দালয়।
কি মঙ্গল বরিষণ, করিছেন নিরঞ্জন,
স্ব অঞ্জন নাশ কর লইয়ে তাঁর আশ্রয়।।

২৭। **রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।**

তব জ্যোতি শ্রুতি মনোহর। হে বিশ্বধর।
স্বকৃত প্রকৃত শুভ্র সর্ব্ব লোক শান্তিকর।
দিবাকর দিবাকর, শশধর শশধর,
কোটি তারা কোটি সৃষ্টিধর দীপ্তিকর।
নীল পীত নানা বর্ণ, জলে স্থলে পরিপূর্ণ,
কি প্রভা কি আভা কানন ভিতর।
সুশোভে তব বদন, সত্য-প্রেম-প্রস্রবণ,
বিকাশে হৃদি আকাশে যেন হিতকর।
হলে পাপের বিনাশ, পুণ্য মুখে সপ্রকাশ,
নয়নের নয়ন নহে নয়নগোচর।
কুরূপা কুৎসিতা রামা, তার জ্যোতি অনুপমা,
পতিব্রতা পবিত্রতা যদি চিত্তাকর।
সদা ভাবি তব জ্যোতি, দয়া কর মোর প্রতি,
দেখিতে দেখিতে যেন যাই লোকান্তর।।

২৮। **রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।**

নও তুমি কেবল কাশীবাসী, বিশ্বেশ্বর হে।
যেখানে ভ্রমণ করি সেই বারাণসী।
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ,
প্রকৃত অন্নপূর্ণা তুমি ব্রহ্মাণ্ড-নিবাসী।

স্নান তীর্থ নাহি দেখি, চিত্ত তীর্থে সদা সুখী
ধন মান চাহি না হে শান্তি অভিলাষী ॥

২৯। **রাগিণী ঝিঁজিট—তাল মধ্যমান।**

কি দিব তোমারে বল না, হৃদয়ের ধন।
কেবল সম্বল মোর তব আরাধনা।
প্রদান করহ চিত, তাপিত বিশুদ্ধ নত,
হলে তোমায় অর্পিত, পুরিবে বাসনা।
যত স্নেহ প্রেম ধরি, কৃপা করি লও হরি,
আর কেন পাপে মরি, ঘুচাও যন্ত্রণা ॥

৩০। **রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।**

মন তো দুর্ব্বল নহে যদি থাকে প্রকৃত।
পাপেতে দুর্ব্বল মতি পাপে করে বিকৃত।
পরিষ্কার সংস্কার আবিষ্কার হে কত।
নিরঞ্জন সযতন মনে হয় আবৃত।
সার জ্ঞান দূর জ্ঞান সদা মনে উদিত।
সৃষ্টি কার্য্য সব ধার্য্য বিনাচার্য্য গৃহীত।
ভব ভাব ব্যর্থ ভাব ক্রমে ক্রমে দূরিত।
সারভাব শুদ্ধভাব ভাবেতে হয় ভাবিত।
ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ সদানন্দ অমৃত।
করি পান পায় ত্রাণ ভোগে সুখ অচ্যুত ॥

৩১। **রাগিণী সুহিনী—তাল মধ্যমান।**

কত পাপ করিয়াছি তোমার নিকট,
তথাপি না ত্যাগ কর রেখেছ নিকট।
করে ধরি কুসন্তান, ক্রোড়ে মাতা দেন স্থান,
সান্ত্বনা-সুধাতে দূর করেন সঙ্কট।
ততোধিক তব দয়া, দিয়া স্বীয় পদ-ছায়া,
কালে নাশ কর তাপ পাপ বিকট ॥

৩২। **রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়া।**

তবে কেন নয়নের বারি নিবারি।
যদি এই বারিতে পাই সেই রূপের মাধুরী।
রোদনে কর শোধন, নিরন্তর অন্তর ধন,
নাশিবে শান্তি তপন, পাপ সর্ব্বরী।
পরে পাইবে যে হাস্য, সে হাস্য নয় উপহাস্য,
সদা আনন্দ প্রকাশ্য, সুধা সর্ব্বোপরি ॥

৩৩। **রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল মধ্যমান।**

তব অধীন মোরে কর, ওহে বিশ্বধর।
তোমা ছাড়ি স্বাধীনতা অতি ভয়ঙ্কর।
গতি শক্তি জীবন, সকলের তুমি জীবন,
ইচ্ছা মোর কর প্রভো যে ইচ্ছা তোমার।।

৩৪। **রাগিণী ঝিঁজিট তাল—আড়া।**

ওরে বৃন্দাবনের লোক।
দেখারে আমাকে তোরা আলোকের আলোক।
যদুপতি, ব্রজপতি, কভু নহে সে মূরতি,
দেখারে সে হৃদি-পতি, ভূলোক, দ্যুলোক।।

৩৫। **রাগ শ্রী—তাল কাওয়ালি।**

প্রেমনগরে চল যাই।
সেই প্রেময় প্রেমেশ্বরের দিব হে দাহাই।
প্রেমেতে মগন হব, প্রেমামৃত পান করিব,
প্রেমানন্দ হইয়া ভ্রমিব ঠাঁই ঠাঁই।।

সম্পূর্ণ।